ভোটের জন্য টাকা জোগাড়ে সরকার কর্ত্তৃক চোরাকারবারীদের সুবিধা দান

★ চিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা আত্মসাত ★

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | শনিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১, ৫ই আশ্বিন ১৩৫৮ | মূল্য—দুই আনা

কংগ্রেসী লুঠের নয়া অভিসন্ধি

সম্প্রতি কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রভান গুপ্ত ও কে, কে, বিড়লার মধ্যে কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা তোলার বিষয় নিয়ে যে কেচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে আরও খবর জানা গিয়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং গান্ধী ভক্তদের সেরা যথা গোবিন্দ বল্লভ পন্থও এর সঙ্গে জড়িত। জানা গিয়েছে যে, গত জুন মাসে চিনির রাজাদের সঙ্গে কংগ্রেসী পাণ্ডাদের যে সভা হয় তা গোবিন্দবল্লভ পন্থের নৈনিতালের বাড়ীতে তাঁর, চন্দ্রভান গুপ্ত এবং অন্য আর একজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই হয়। মন্ত্রীরা ভোটের জন্য এইসব চিনির রাজাদের কাছে ৫০ লাখ টাকা চান এবং বহুক্ষণ দরদস্তুরের পর দু কিস্তিতে ঐ পরিমান টাকা দিতে ব্যবসায়ীর দল রাজী হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করেন। সেই সর্ত্তগুলির মধ্যে চিনির দর বাড়িয়ে জনসাধারণের গলায় ছুরী দেবার সর্ত্ত প্রধান।

চিনির ব্যবসাদার ছাড়াও উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী মণ্ডলী অন্যান্য শিল্পপতিদের কাছ থেকেও মোটা টাকা তুলছেন। এই টাকা তোলার ফন্দিও চমৎকার। যে সব চোরাকারবারীদের নামে জনসাধারণের চাপে পড়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল চোরাকারবার চালাবার অভিযোগে, তাদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা নিয়ে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। তারাও আগের চেয়ে বেশী বেপরোয়াভাবে চোরাকারবার চালাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ গোবিন্দবল্লভ পন্থ সিংহনিয়া ব্যবসায়ী গোষ্টি, জে, পি, শ্রীবাস্তব কোম্পানী জোট প্রভৃতি বড় বড় পুঁজিপতিদের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে এদের কাছ থেকে এক কোটী টাকা তোলার ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য সুযোগ সুবিধা গুলির প্রত্যেকটিই দেশবাসীকে শোষণ করা ও ঠকাবার সুবিধা।

শুধু উত্তর প্রদেশেই যে এই অবস্থা তা নয়। উড়িষ্যায় প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য তিনটি জিপগাড়ী, ৫০টি সাইকেল এবং কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হবে—কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। এই বিরাট টাকা চোরাকারবারীদের সহযোগীতায় আদায় করা হবে। বিনিময়ে এই সব সমাজবিরোধী লোককে তাদের সমাজ বিরোধী কাজ চালাবার পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীদের কংগ্রেস টিকিট দেওয়া হবে নির্বাচন লড়ার জন্য। অবশ্য কংগ্রেস যে এই বিরাট টাকা খরচ করছে তার হিসাব দেখান হবে না। নির্বাচনে সর্বোচ্চ ব্যয় আইনের গণ্ডীর মধ্যেই রাখা হয়েছে বলে দেখান হবে।

চোরাকারবারীদের সাহায্যে যারা জিতবে তারা চোরাকারবারীদের বন্ধুই, সুতরাং দেশবাসীর শত্রু। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থ হল—এই সমাজ বিরোধী শক্তিগুলিকে আবার ক্ষমতা করায়ত্ত করার সুযোগ দেওয়া। তা করা আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা এক কথা। তাই কংগ্রেসের এই বিরাট ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে এখন থেকেই জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে ও অঞ্চলে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে "গণকমিটি" গড়ে তুলুন; তার অধীনে নিজেদের সংঘবদ্ধ করুণ এবং এই জনসংগঠনের নেতৃত্বে প্রকৃত জনপ্রতিনিধির পক্ষে ভোট দিয়ে প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে ব্যর্থ করুণ। আগামী নির্বাচনে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাতে হলে, এ কাজগুলি এখন থেকেই করতে হবে।

কংগ্রেসী সুশাসনের নমুনা

পেপসুতে চাষীদের ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার

★ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, প্রতিবাদ করায় কারারুদ্ধ ★

দরিদ্র চাষী রমণী ধর্ষিত

রাজামহারাজা ও জমিদারদের স্বার্থে পরিচালিত কংগ্রেসী রামরাজত্বে গরীব চাষীদের জীবন, ইজ্জত ও যথাসর্বস্ব কিভাবে বিপন্ন, পেপসুতে তার আর এক দফা প্রমাণ মিলেছে। হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানায় সাধারণ চাষীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা জনসাধারণের অজানা নয়—বাড়ীঘর জালিয়ে দেওয়া, বিনা কারণে গুলি করে মারা, কথায় কথায় বেদম প্রহার, যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, চাষী রমনীদের ধর্ষন এসব ব্যাপার ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। বহু নিরপেক্ষ সাংবাদিক এই ধরণের অত্যাচারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশও করেছেন, ফলে ভারত সরকার স্বাধীনমতামতযুক্ত সাংবাদিকদের ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছেন না।

পেপসুতেও ঐ সব অত্যাচার নির্মমভাবে চালান হচ্ছে। সরকারী পুলিশ ও বিশ্বেদর গুণ্ডা বাহিনী সাংরুর ও ভাতিণ্ডা অঞ্চলে চাষীদের ওপর জমিদারের হয়ে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। কালাইত গ্রামের প্রজাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে গুণ্ডার দল প্রায় ৫০ হাজার টাকা লুটে নিয়ে আসে। খেরি সায়িয়ান গ্রামের একটি নাবালিকা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেলে তার বাবা, নবাব, থানায় রিপোর্ট করতে গেলে তাকে বেকসুর মারধোর করা হয় এবং ফাটকে আটকে রাখা হয়। নাগরা গ্রামের কঙ্ক নামক একজন গরীব চাষীর স্ত্রী, নিকোর উপর বলাৎকার করা হয়। কঙ্ক থানায় ডাইরি করতে গেলে তার কাছ থেকে ২০০৲ টাকা চাওয়া হয়। গুণ্ডারদল থানার দারোগাকে ৬০০৲ টাকা ঘুষ দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেয়। এইভাবে পেপসুতে গরীব চাষীদের ওপর জঘন্য নির্য্যাতন চালান হচ্ছে। কোন সভ্য দেশে যে এই অবস্থা চলতে পারে তা ধারণা করা যায় না। গান্ধীভক্ত কংগ্রেসীদের রামরাজত্বে সাধারণ গরীব দেশবাসীর এই অবস্থাই হয়।

মার্কিনের পায়ে খনিজ সম্পদ বিসর্জন

ভারতকে কাঁচা মালের দেশ হিসাবে বেঁধে রাখার চক্রান্ত

ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমান খনিজ সম্পদ বর্ত্তমান অথচ ভারতবর্ষে শিল্প গড়ে উঠছে না। কংগ্রেসী সরকার সম্প্রতি যে পাঁচখানা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে তাতেও এই সব খনিজ দ্রব্যের সদব্যবহার করে দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে সবল করার কোন কথা নেই। তার বদলে দেশকে এই সব কাঁচা মালের জোগানদার হিসাবে রক্ষা করার প্রচেষ্টা রয়েছে। বিদেশী শাসকের দল তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি হতে না দিয়ে তাকে কাঁচামাল জোগান দেবার ও শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কংগ্রেসী সরকার সেই সর্বনশাকর নীতিরই-বাহক হিসাবে চলছে। এদেশের খনিজ সম্পদ এবং রপ্তানী নীতি আলোচনা করলেই এই কথার প্রমাণ মিলবে।

ইংরাজ আমলেও বৃটীশ বোর্ড অফ ট্রেডের রিপোর্টে কয়লা ও ক্রমিয়াম ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য রপ্তানী না করার উপদেশ দেওয়া আছে। সেই আমলের জিওলজিক্যাল সার্ভের সিরিল ফক্সও বলেছেন—আমাদের বছরে ৪০ লক্ষ টন কয়লা খরচ হয়; সেই হিসাবে ভারতের রিজার্ভ কয়লায় তার ৪০০ বছর চলা উচিত, কিন্তু যে ভাবে কয়লা ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে ৪০ বছর চলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সে কালেও ভারতবর্ষের কয়লা যাতে নষ্ট না করা হয় তার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এমন কি ১৯৪৯ সালের সংরক্ষণ কমিটি ও এই কথা সুপারিশ করে ছিল। অথচ ভারত সরকার কয়েকজন পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই অমূল্য সম্পদ বৃটেনে রপ্তানী করতে অনুমতি দিয়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় ভারতবর্ষের উন্নত ধরণের metallurgical

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের অভিযান

ভারতীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের জন্মের পর থেকে একটা কথাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমান করেছে যেটা হচ্ছে তার মতবাদিক নির্ভুলতা। গত চার পাঁচ বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মাপ-কাঠিতে সঠিকভাবে বিচার করে কর্ত্তব্য নিরূপন করতে কোথায়ও তার ভুল হয়নি এতটুকু। এই নির্ভুলতা শুধু বলার ওপর নির্ভর করেনা তার বাস্তব প্রমানই হচ্ছে বড় কথা। অন্যান্য বহু জটিল ও সুক্ষ রাজনৈতিক তত্ত্বর কথা বাদ দিয়েও ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফৎ যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সরকার যে নতুনভাবে পুঁজিবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার একটি যন্ত্র এবং এর মারফৎ যে জনগনের কোন মৌলিক সুখ সুবিধাই আসতে পারেনা সে কথা একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই সেদিন ঘোষণা করেছে। সমস্ত তথাকথিত শ্রমিক শ্রেণীর দল এই ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকুণ্ঠ সমর্থনই জানিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস আজ প্রমান করেছে এই কংগ্রেসী সরকারের অসারতা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ শোষণ ও কুশানের প্রতক্ষ্য অভিজ্ঞতা সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চিন্তা গত দিক থেকে এস, ইউ, সি তার সঠিক নেতৃত্ব বহুদিন ধরেই চালিয়ে এসেছে।

কিন্তু একথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে একটি সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণীর দলের পক্ষে এটাই সম্পূর্ণ নয়। এই মতবাদিক নেতৃত্বকে সাংগঠনিক নেতৃত্বের মারফৎ বাস্তবভাবে প্রয়োগ করে শ্রমিক বিপ্লবকে সফল করাই তার অস্তিত্বের সার্থকতা। আজ আমরা নিঃসঙ্কোচভাবে ঘোষনা করছি যে সাংগঠনিক নেতৃত্বের দিক থেকে এস, ইউ, সি এখনও পিছিয়ে আছে অনেকখানি। গত কয়েক বছর তার বিপুল অগ্রগতির ভেতর দিয়েও প্রয়োজনানুযায়ী সাংগঠনিক শক্তির অভাব স্বীকার করতেই হবে। আর এই অভাব পূরনের জন্যই চাই কর্মীদের দ্বিগুন উৎসাহ, ঐকান্তিকতা ও আত্মত্যাগ। এই অভাব পূরনের ভেতরই নিহিত আছে ভারতের আগামী বিপ্লবের ভাগ্য—তার সফলতা বা বিফলতা। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে জনগনকেও তার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারকে তাদের সর্ব্বপ্রকার সক্রিয় সাহায্য, ও সহানুভূতি নিয়ে এগুতে হবে। হাজারে হাজারে, এস, ইউ, সির পতাকাতলে সমবেত হয়ে তার সাংগঠনিক দুর্ব্বলতাকে চিরতরে দূর করতে হবে—সমাজ বিপ্লবের পদ্ধতিকে দ্রুততর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।

যে সাংগঠনিক শক্তির কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই দুপ্রকারের। যথা—(১) গন সংগঠন (২) পার্টি সংগঠন। শ্রমিক শ্রেণীর দল অর্থই হচ্ছে জনগনের অগ্রগামী সংঘবদ্ধ বাহিনী। বিপুল গণ সমষ্টির সাথে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগই তাকে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে রূপ দিতে পারে। গণ সংগঠন গুলোই হচ্ছে এই যোগাযোগ রক্ষার সবচেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালীউপায়। পার্টি সংগঠন যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে উন্নততর সংগঠন, যে সংগঠনের সভ্য হতে হলে বহু কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, মার্কসবাদকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহন ও প্রয়োগ করতে হয় এবং যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পার্টির সভ্যভুক্ত হওয়া বাস্তবভাবে সম্ভব নয়—সেই জন্যই গনসংগঠনগুলোর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই জন্যই কোটি কোটি লোক পার্টির সভ্য হতে পারে না—শুধুমাত্র সচেতন অগ্রগামী অংশের পক্ষেই এটা সম্ভব। তাই পার্টি সভ্যের বাইরে যে বিরাট জনসমষ্টি রয়েছে তাদের ভেতর রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা, তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূলে আনা ও সর্বশেষে বিপ্লবের বিশেষ শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার অস্ত্রই হচ্ছে বিভিন্ন গণসংগঠন। গন সংগঠনগুলির শক্তির ওপর তাই বিপ্লবের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করছে। সুতরাং যে সমস্ত কর্মী বিশেষভাবে গণসংগঠন গুলির সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের এই তাৎপর্য্যকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে—গণ সংগঠনের ভেতর বিপ্লবী কায়দায় কাজ করার কৌশলকে বিশেষ ভাবে আয়ত্ব কবতে হবে। সংগঠকদের কাজ করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে তাদের কর্মক্ষেত্র গুটি কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে নয়—বিরাট জনসাধারণকে নিয়ে তাদের কারবার। সুতরাং গণসংগঠনের কাজের Individualistic manner কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে Collective and organisational manner চালু করতে হবে। বর্তমানের প্রতিক্রিয়ার যুগে যেখানে গনআন্দোলনকে দমন করার জন্য মালিকী ও সরকারী শক্তি রয়েছে প্রচুর, অতীত আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বিভিন্ন দুর্ব্বলতা যখন জনগণের মনে কোন আশার সঞ্চারই করে না সে ক্ষেত্রে সংগঠকদের গনসংগঠন গড়ে তোলার কাজে হতে হবে অসাধারণ সহিষ্ণু, অর্জ্জন করতে হবে অভাবনীয় ধৈর্য্য। মনের দৃঢ়তা ও কর্মক্ষমতা নিয়ে জনতার সাথে এমন ভাবে মিশতে হবে তাদের প্রতিটি দাবী দাওয়া ও তার প্রতিকার সম্পর্কে অবিরত এমন ভাবে তাদের মনে আঘাত করতে হবে যে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ভেঙ্গে ফেলে সংগঠন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। প্রত্যেকটি সংগঠকের চুম্বকের মত আকর্ষনীয় শক্তি অর্জন করতে হবে যাতে জনতা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটী ক্ষেত্রেই এই সমস্ত আন্দোলনের যেমন নিজস্ব দাবী দাওয়া ও একটা নিজস্ব গতি আছে তেমনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আবার এই সমস্ত আন্দোলনকে রাজনৈতিক চেতনায় উন্নীত করা প্রয়োজন। তাহলেই এই সমস্ত আন্দোলনগুলো যথাযথ পরিণতিতে পৌছুতে পারে। মনে রাখা দরকার যে যখন দেশ জোরা বিপ্লবী আন্দোলন দ্রুত অগ্রগতির মুখে, তখন হাজারে হাজারে লোক আপনা হতে আন্দোলনে যোগ দেয়, প্রয়োজন মত প্রাণ বলিও দিয়ে থাকে—কিন্তু যখন গণ-আন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে থাকে তখন তাকে ধৈর্য্য সহকারে অসীম কষ্ট সহ্য করে গড়ে তোলে তাঁরাই যাদের রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত উন্নত ধরনের। এই প্রতিকূল অবস্থা সংগঠকদের কর্ম ক্ষমতা বিচার করারও একটি ক্ষেত্র বটে। এই ভাবে তিলে তিলে জীবন পাত করেই আমাদের এগুতে হবে—গনসংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এই গণ-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির সভ্য হিসেবে পরিগনিত হবে। সুতরাং গণ সংগঠন ও পার্টি সংগঠন দু'টিকেই শক্তিশালী করার জন্য গণ আন্দোলনের দিকে প্রতিটি কর্মীর শক্তি নিয়োগ করতে হবে।

পার্টি সংগঠনের পক্ষেও উপরোক্ত নির্দ্দেশ সমূহ সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও কতকগুলো দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী মতবাদের প্রয়োজনীয়তা; সে সম্পর্কে প্রতিটি কর্মীর, দলের চিন্তাধারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে এই সঠিক মতবাদিক নেতৃত্বই আমাদের বুনিয়াদী কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যক কর্মীদের নিরাশার ভাব দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবে কাজেও ভাটা পরে। এটা তখনই হয় যখন কর্মীরা তাদের কাজের সফলতা বিফলতা, উন্নতি বা অবনতি কিছুই বুঝতে পারে না। এটা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে নিরাশা বা হতাশার মার্কসবাদী আন্দোলনে কোন স্থানই নেই। শ্রমিক দলের দর্শন মার্ক্সবাদ, একটি সৃজনশীল দর্শন। তাই সর্ব্বপ্রকার হতাশার ভাব কাটাবার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দলের চিন্তা ও মার্কসবাদী দর্শনকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে অন্যদিকে প্রতিটি আন্দোলনের ভুল ত্রুটি, লাভ ক্ষতিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তাহলেই ফুটে উঠবে অগ্রগতির চেহারা কেটে যাবে সমস্ত আন্দোলন বিমুখতার ভাবধারা। গত কয়েক বছরে যখন প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর বড় বড় দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি হওয়াতো দূরের কথা অন্তর্দ্বন্দ ও মতবাদিক বিচ্যুতির দরুন ক্রমশঃ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং আরো যাচ্ছে সেই সময় একমাত্র সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই তার অত্যন্ত ক্ষুদ্র-শক্তি নিয়েও নানা প্রকার অসংখ্য বাধা বিপত্তি সত্বেও বহুগুনে কলেবর বৃদ্ধি করেছে। এথেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে—উৎসাহ গ্রহন করতেই হবে যাতে করে বর্ত্তমানের কাঠামোকেও অতি শীঘ্র আরো বৃহত্তর রূপ দিতে পারি।

তাই প্রতিটি কর্মীর আজ প্রয়োজন দলের শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে, তার আদর্শকে আয়ত্ব করে স্বার্থহীন ভাবে দলের শক্তি বৃদ্ধির কাজে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করা—এবং Concrete acheivement বা বাস্তব ফললাভের মারফৎ নিজেকে যোগ্য কর্মী হিসেবে পরিচয় দেওয়া। ব্যক্তিগত সুবিধে অসুবিধে সমস্ত কিছু এই মাপ-কাঠিতেই চালনা করতে হবে,—সমালোচনা আত্মসমালোচনার মারফৎ কর্ত্তব্য কর্মের সারবত্তাকে যাচাই করতে হবে। আমাদের কর্মীদের এক মুহূর্ত্তও ভুললে চলবেনা আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের গুরুত্ব। তাই আশাকরি প্রত্যেকটি কর্মী এই সমস্ত নির্দ্দেশসমূহ মেনে চলে এবং তাহাকে যথাযথভাবে রূপায়িত করে নিজেদের যোগ্য কর্মী হিসেবে পরিচয় দেবেনই উপরন্ত ভারতবর্ষের আগামী বিপ্লবকে সাফল্য মণ্ডিত করতে শ্রমিকশ্রেণীর দল এস, ইউ, সি, কে সবিশেষ সাহায্য করে সর্ব্বপ্রকার শোষণ থেকে দেশকে চিরতরে মুক্ত করতে পারবেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এদাবী আমাদের কাছে করছে—এটা আমাদের পালন করতেই হবে।

জাপ মার্কিণ চুক্তি—যুদ্ধের চুক্তি

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের থাবা ধীরে ধীরে গেড়ে বসছে। মার্শাল প্ল্যান, উত্তর অতলান্তিক চুক্তি প্রভৃতির মারফৎ আমেরিকার যুদ্ধবাজ কর্ত্তারা ইউরোপে তাদের ঘাঁটি পাকা করেছে; দীর্ঘ দিন ধরে এশিয়ায় ও সেই চাল চালার চেষ্টা হচ্ছিল—জাপ—মার্কিন চুক্তি তাকে প্রকাশ্যে সরাসরিভাবে রূপ দেবার অস্ত্র হিসাবে জন্ম নিল। এশিয়ায় তাদের কার্য্যকলাপকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর দল "রক্ষাব্যবস্থা", "অনগ্রসর জাতিকে সাহায্য" এবং "শান্তি, প্রগতি ও সভ্যতার বিকাশ" প্রভৃতি গালভরা নামে অভিহিত করলেও, আদতে তাদের প্রত্যেকটি ক্রিয়া-কলাপের মূল উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসন কায়েম করা, বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি তা যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকই বুঝতে পারবেন। মার্কিণী রক্ষা ব্যবস্থার অর্থ হল দুর্বল দেশের স্বাধীনতা হরণ—ফিলিপিনোদের নাকি মার্কিণরা রক্ষা করছে; অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে লাখ লাখ মার্কিণ সৈন্য আড্ডা গেড়ে বসে ফিলিপিনো-দের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করছে, ঐ দ্বীপগুলির বহু স্থান ইজারা নিয়ে সেখানে পাকাপোক্ত সামরিক ঘাঁটি গেড়ে ফিলিপাইনের সার্ব-ভৌমত্বকে লঙ্ঘন করছে এবং অসংখ্য স্বাধীনতা কামী ফিলিপিনোদের বুকের রক্তে মাটি ভেজাচ্ছে। অনগ্রসর দেশকে মার্কিনী সাহায্যের নমুনা হল, সেই দেশ-গুলিকে উপনিবেশে পরিণত করে নিরঙ্কুশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালান। আর শান্তি ও প্রগতির কথা না বলাই ভাল, যে দেশের সেরা সেরা রাজনীতিবিদরা দম্ভ করে বলে —এশিয়ার জনসাধারণকে এক মুঠা ভাত দিলেই তারা মার্কিণের হয়ে লড়বে এবং তাদেরই সৃষ্ট দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এশিয়া-বাসীদের কামানের খোরাক করার চেষ্টা করছে মার্কিনী স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের মুখে শান্তির কথা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ সব ধাপ্পাই জাপ মার্কিন চুক্তির মধ্যে ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। এই চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাপানকে মার্কিনের উপনিবেশে পরিণত করে জাপানবাসীদের স্বাধীনতাকে হরণ করা, ইচ্ছামত জাপানের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের দুঃখ দৈন্য দারিদ্রকে চিরস্থায়ী করা, সোভিয়েট ও নয়াচীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য জাপান ও আশপাশের দ্বীপগুলিতে সামরিক ঘাঁটি গাড়া, সারা বিশ্বের বিশেষ করে এশিয়ার শান্তি ভঙ্গ করে লড়াই বাধান। এই জঘন্য চুক্তি সমস্ত আন্তর্জাতিক ন্যায়-নীতি ও চুক্তির মাথায় লাথি মেরে মার্কিনী ধনকুবের যুদ্ধ বাজদের মতলব হাসিল করার প্রকাশ। জাপানের প্রধান মন্ত্রী যোশিদার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দান চুক্তির এই চরিত্র দূর করে না। যোশিদা যেহেতু সই করেছে সেই হেতু এই চুক্তি জাপ স্বার্থানুকুলে—এই বলে মার্কিন প্রচারকরা যে ঢাক পিটছে তার মধ্যে কোন সত্য নেই; কারণ প্রত্যেক দেশেই মিরজাফরের দল থাকে যারা দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ বড় করে দেখে, কয়েক টুকরা ব্যক্তি বা শ্রেণীগত সুবিধার জন্য যারা দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর পায়ে বিকিয়ে দেয়। যোশিদা সেই গোত্রেই পড়ে। কুইসলিঙের স্বধর্মী এই বিশ্বাস-ঘাতকের স্বাক্ষরে তাই জাপ-মার্কিন চুক্তির আসল রূপ পালটে যায় না।

জারের রাশিয়াকে পরাজিত করার পর জাপান এশিয়ার আশার স্থল বলে বহু এশিয়া বাসী ভাবতে থাকেন। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির লক্ষ্য যে পররাজ্য গ্রাস, ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাবার ইচ্ছা এবং শক্তি থাকলে সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টা—এই সত্য জাপান ও প্রমাণ করল। সে হয়ে উঠল এশিয়ায় ফ্যাসিবাদের ঘাঁটি, সারা জগতের শান্তির বিঘ্ন স্বরূপ। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা-কালীন অবস্থায় জাপানকে নিয়ে কী করা হবে তা বার বার আলোচিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা কামী শান্তি-প্রিয় জনসাধারণ দাবী করেছেন জাপান যাতে আবার এশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতার আতঙ্কের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জাপান হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শান্তিপ্রিয়। জাপবাসীদের ও এশিয়ার জনতাকে শোষণ করার সুযোগ তার থাকবে না। জনতার এই সমবেত ইচ্ছার ফলেই কায়রো, ইয়াল্টা, পট্‌সডাম এমন কি জাতিসংঘ ঘোষণায় বার বার করে স্বীকার করা হয়েছে জনতার এই সব দাবী।

বর্ত্তমান জাপ মার্কিন চুক্তিতে এই সব আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রত্যেকটা লঙ্ঘণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষণায় দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল—জাপানের সঙ্গে আলাদা আলাদা চুক্তি মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি করতে পারবে না; পট্‌সডাম চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,—"preparatory work of the peace settlements should be undertaken by those states which were signatories to the terms of surrender imposed upon the enemy state concerned"। অথচ মার্কিন ও বৃটীশ জাপ মার্কিন চুক্তিতে সে কথা অগ্রাহ্য করে চীন ও সোভিয়েটকে বাদ দিয়ে আলাদা চুক্তি করেছে। সুতরাং এ চুক্তি কোন ক্রমেই আন্তর্জাতিক সম্মানের ও আস্থার বিষয় হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জাপান বিষয়ে যতগুলি চুক্তি হয়েছে তাতে কোথাও মার্কিনকে জাপঅধিকৃত দ্বীপগুলির শাসন ভার দেওয়া হবে—এমন কোন সর্ত্ত নেই; অথচ বর্ত্তমান চুক্তিতে লিগ অফ্ নেশান্স প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাপানকে mandatory প্রথায় শাসন করার জন্য যে দ্বীপগুলি দিয়েছিল সেগুলি ছাড়াও রিউকিউ, বোনিন, ভলক্যানো, রোসারিও, মারকাস প্রভৃতি দ্বীপগুলি অধিকারে রাখার সুবিধা মার্কিনকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না এই চুক্তির লক্ষ্য এশিয়ার এই ভূখণ্ডগুলি মার্কিনের গ্রাসে নিয়ে আসা। তৃতীয়তঃ কায়রো, ইয়াল্টা ও পট্‌সডাম চুক্তি অনুসারে তাইওয়ান ফিউরাইল এবং পেসকাডোর দ্বীপগুলি চীনের এবং সাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশ সোভিয়েটের প্রাপ্য। অবশ্য তাইওয়ান ও পেসকাডোর চীনের এবং সাখালিন সোভিয়েটেরই দেশভুক্ত। সুযোগ বুঝে জাপান এগুলি বেআইনীভাবে গ্রাস করেছিল। সুতরাং ন্যায় সঙ্গত ভাবে এই দ্বীপগুলি চীন ও সোভিয়েটেরই প্রাপ্য। অথচ বর্ত্তমান চুক্তিতে সে বিষয়ে শুধু কিছু বলা হয় নি তাই নয় তাইওয়ানে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই করা হয়েছে। অতএব বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না এই চুক্তির মারফৎ আমেরিকা পররাজ্য গ্রাস করার ফন্দিই করেছে। চতুর্থতঃ পটসডাম চুক্তি ও দূর প্রাচ্য কমিশনের জাপ আত্ম সমর্পন চুক্তিতে বলা হয়েছে—জাপানকে প্রকৃত গণতন্ত্রী ও শান্তিপ্রিয় দেশে রূপ দিতে হবে অথচ তা না করে জাপানকে আমেরিকার যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছে। দ্রুতগতিতে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিয়ে দেশের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে, পুলিশবাহিনীর নামে জাপানের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, জাপানের অস্ত্র নির্মান কারখানাগুলিতে পূরাদমে কাজ চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা হচ্ছে, বিমান ঘাঁটিগুলি যুদ্ধের অনুকুলে সংস্কার করা হচ্ছে, জাপান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের কোরিয়ার ক্ষেত্রে পাঠান হচ্ছে। এ সব কাজ চুক্তি বিরুদ্ধ এবং যুদ্ধের অনুকুলে, সুতরাং শান্তিপ্রিয় ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে জাপানকে তৈরী না করে তাকে মার্কিন তাঁবেতে যুদ্ধবাজ দেশে রূপ দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষে জাপানে লাখ লাখ মার্কিন সৈন্য রেখে জাপানের সার্বভৌমত্ব ও জাপবাসীদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হল। এই চুক্তির পর আমেরিকার সঙ্গে জাপানের একটা সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে, যাতে করে আমেরিকা বর্ত্তমানে যেমন জাপানকে সোভিয়েট ও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে সেই ব্যবস্থাকে আরও পাকাপোক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সুতরাং জাপ মার্কিন চুক্তি যে শান্তি চুক্তি নয় বরং নতুন আর একটা যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৪৬ সালে আমেরিকার ম্যাক-নাইট পত্রিকায় যে মত প্রকাশ করা হয়েছিল তার পাকা রূপ জাপ মার্কিন চুক্তি। তাতে বলা হয়েছিল—ম্যানিলা, টোকিও ও সাংহাই এই তিনটি সহর নিয়ে যে ত্রিভুজ তা সুদূর প্রাচ্যের হৃৎপিণ্ড, প্রাচ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য এই ত্রিভুজের শাসন অপরি-হার্য্য। ম্যানিলা মার্কিন খপ্পরে, টোকিও তাই, সাংহাইকে পাবার জন্য আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু শান্তিকামী শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী; সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধবাজদের ধ্বংস অনিবার্য্য, নবজাগ্রত এশিয়ার লৌহ আঘাতে মার্কিন জঙ্গীবাদ ব্যর্থ হবেই হবে।

পশ্চিম বাংলা ও সরকার বিশ্ব-বিদ্যালয় সৃষ্ট শিক্ষা সঙ্কটের বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ অভিযান।

পশ্চিম বাংলার শিক্ষা সঙ্কট আজ চরমে এসে পৌঁচেছে। হাজারে হাজারে ফেলের হার, থেকে আরম্ভ করে, সমস্ত শিক্ষা সঙ্কোচনীতি শিক্ষা জগতে এক বিষম দুর্যোগ এনে দিয়েছে। এই অচলাবস্থার হাত থেকে সমস্ত ছাত্র সমাজকে রক্ষা করার জন্য, উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম বাংলার সমস্ত ছাত্র সংগঠন সম্মিলিত-ভাবে আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে তারা এক স্মারকলিপি ভাইস্ চ্যান্সেলার, চ্যান্সেলার, শিক্ষা মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট পাঠিয়েছে। স্মারকলিপিতে, রাধাকৃষ্ণ কমিশনের রায়কে চালু করা; বি, এল, মিটারের কমিশনের রায় প্রকাশ করা, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে বার শত ছাত্রকে দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও কোন এক বিষয়ে ২।১ নম্বর কম পাবার জন্য ফেল করানো হয়েছে তাহাদের পাশ বলে ঘোষণা করা, দুবার ফেল করলে পুনরায় ছাত্রদের পড়তে দেওয়া হবে না মাধ্যমিক বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহারের প্রভৃতি দাবী জানানো হয়েছে।

School Final পরীক্ষার ফী বাড়িয়ে দেবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্মারকলিপিতে এই সিদ্ধান্তেরও অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করা হয়।

আর একটি প্রধান দাবী হচ্ছে যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইংরেজীতেও পাশের নম্বর শতকরা ৩০ করতে হবে।

এই সমস্ত দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ, সরকার প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের দ্বারা একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজে বিরাট আন্দোলনে সূচনা দেখা দিয়েছে। ২০শে সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে এক সম্মিলিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সমাবেশ হয়ে গেছে।

নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট

আর, সি, পি, আই ও সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে কামড়াকামড়ি

সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের স্বার্থ বিসর্জন দেবার চক্রান্ত

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলদেশে কলিকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি কমরেড প্রভাত কর। সভাপতি ছাড়াও তুষার চক্রবর্ত্তী, তাঁরা দাস, সুবোধ ব্যানার্জী, সতু সান্ন্যাল প্রভৃতি বক্তা বক্তৃতা করেন। বক্তাদের প্রত্যেকেই আগামী ১ লা অক্টোবর তারিখ হ'তে সারা ভারত ব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের যে সাধারণ ধর্মঘট হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকে কার্য্যকরী করার আহ্বান দেন।

বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভিতরে ভিতরে গোপন চক্রান্ত চলছে। এ দিকে যেমন কংগ্রেস আই. এন. টি. ইউ. সি. ও মালিকি পুঁজির মিলিত প্রচেষ্টা চলছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধতাকে ভাঙ্গার, অন্যদিকে তেমনি সে চেষ্টাকে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে চলেছে সোস্যালিষ্ট পার্টি ও ঠাকুরপন্থী আর. সি. পি. আই। সারা ভারতবর্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে আই. এন টি ইউ সি.; একমাত্র ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেলায়ই আই. এন. টি. ইউ. সির এই ঐক্যবদ্ধতা ভাঙ্গা-নীতি কার্য্যকরী হয় নি। নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতিই এখনও পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ককর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব করছে। মাঝে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ আই. এন টি. ইউ. সির মারফৎ একবার আর একটা পাল্টা প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সচেতনতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার যখন সারা ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছেন তখন আবার সেই চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় আই. এন. টি. ইউ. সির নেতৃবৃন্দ কর্মচারী ইউনিয়নগুলিকে ভাঙার এবং মালিক পৃষ্ঠপোষিত ভুয়া ইউনিয়ন গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে। সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে হবে নিজেদেরই স্বার্থে।

আই. এন. টি. ইউ. সির এই অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের পরোক্ষ সাহায্য করে চলেছে আর. সি. পি, আই ও সোস্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ। উভয় দলের লক্ষ্য, কেমন করে নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির নেতৃত্ব করায়ত্ত করা যায়। সারা দেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যেখানে জীবন মরণ সংগ্রামের সম্মুখীন হতে চলেছেন, সেখানে নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব হ'ল কর্মচারীদের সংগ্রামী ঐক্য বাঁচিয়ে রাখা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী নেতৃত্ব কায়েম রাখা। এই কারণের জন্যই উচিত হ'ল একটা সাধারণ কর্মসূচীর অধীনে কাজ করে যাওয়া যাতে করে সঠিক সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে, ধর্মঘট সফল হয়, সাধারণ ব্যাঙ্ককর্মচারীর দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ তা না করে, ধর্মঘটের জন্য প্রতিটী কর্মচারীকে সক্রিয় করে তোলার কোন চেষ্টা না করে, বার বার তাগাদা দেওয়া সত্বেও সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য কোন সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ না করে উভয় দলের মূল লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে কেমন করে অন্যকে বেকায়দায় ফেলা যায়। ধর্মঘটের মুখে এই ধরণের ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ি সংগ্রামের অসাফল্য নিয়ে আসতে বাধ্য; ফলে কর্মচারীদের ওপর চূড়ান্ত নিষ্পেষণও নেমে আসবে। নেতৃত্বের হঠকারিতায় সাধারণ কর্মচারীদের দুর্দশার সীমা থাকবে না সুতরাং সাধারণ কর্মচারীদের দায়িত্ব হল—নিজের নিজের ইউনিয়নের নেতৃত্বকে যাচাই করে নেওয়া এবং এই ধরণের সুবিধাবাদী বিভেদকারী নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব কায়েম করে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এই বিরোধের প্রকাশও বেরিয়ে আসছে ক্রমশঃ। সোস্যালিষ্ট পার্টীর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে রেল-ধর্মঘটের ন্যায় তাদের দলের পক্ষে প্রচার হিসাবে কাজে লাগান। তাই নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি কমরেড মেহতা আপ্রাণ চেষ্টা করেন রেলধর্মঘটের প্রস্তাবিত দিনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটডাকতে—সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছাড়াই। এই কারনে ষ্ট্রাইক ব্যালট পর্য্যন্ত নেওয়ার বিরোধীতা করা হয়। বাংলা দেশের সংগ্রামী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা তখন বার বার করে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ওপর থেকে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে ধর্মঘট সফল হবে না, ষ্ট্রাইক ব্যালট, সভা, সমিতি প্রভৃতির মধ্যে মে ধর্মঘটের মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু সে কথায় কাণ দেওয়া হয় না। তারপর যখন রেলধর্মঘটের দিনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট স্থির হল না এবং রেলকর্মচারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সোস্যালিষ্ট পাটী রেলধর্মঘট বানচাল করল তখন থেকে যাতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘটও না হয় তার জন্য ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। তাই তো ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দীর্ঘ দিন কেটে যাওয়া সত্বেও না প্রস্তুত হল কোন সর্বজনস্বীকৃত চার্টার অফ ডিমাণ্ডস্, না চেষ্টা হল ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার। সর্বশেষে ধর্মঘটের সাতদিন আগে জয়পুরে এক, সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে যার আলোচ্য বিষয় বাকি চাঁদা, গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। ধর্মঘটের মুখে ডাকা সাধারণ সভার বিবেচ্য উপযুক্ত বিষয়ই বটে।

অন্যদিকে ঠাকুরপন্থী আর, সি,পি, আই ধর্মঘটের জন্য কোন প্রস্তুতি না গড়ে কথার জালে বাজার গরম করতে লাগল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গোপনে বললেন—"আমরা জানি ধর্মঘট হবে না। অথচ সে কথা সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের না জানিয়ে বক্তৃতামঞ্চে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে লাগলেন। বাস্তবে ধর্মঘটের সফলতার জন্য কোন কার্য্যসূচীই গৃহীত হল না। এদের চাল হল—ধর্মঘটের আহ্বান দিয়ে নিজেদের বিপ্লবী প্রতিপন্ন করা; ধর্মঘট না হলে দোষ দেওয়া যাবে সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এবং সোস্যালিষ্ট পার্টিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে। নিজেদের হাতে নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির পরিচালনা নিয়ে আসা যাবে। এঁরা ভুলে গিয়েছেন—নেতৃত্বের কাজ শুধু ধর্মঘটের আওয়াজ দেওয়া নয়, তাকে কার্য্যকরী করা। তা না করে শুধু গরম বক্তৃতাবাজী করা হল নিছক সুবিধাবাদ। ব্যক্তিনেতৃত্ব হয়ত তাতে দিনকতকের জন্যে কায়েম হতে পারে কিন্তু সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের তাতে দুঃখ দুর্দশা নিপীড়ণ বাড়বে বই কমবে না।

সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বোঝা দরকার, নিজেদের স্বার্থ নিজেদের সংঘবদ্ধতা ও সংগ্রামী সক্রিয়তার মাধ্যমেই রক্ষা করতে হবে। অন্য কেউ এসে তা করে দেবে না। সুতরাং কোন্ নেতাকে, তা যত বড়ই হন না কেন, অন্ধভাবে অনুসরণ করে কিছু লাভ হবে না। ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়। তাই নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার সংগঠনকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বিভেদকারী সুবিধাবাদী প্রভৃতি সাধারণ কর্মচারীর স্বার্থবিরোধী নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে, নিজেদের সংগ্রামের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ধর্মঘটের পথে নামতে হবে। সেই হল বাঁচার একমাত্র পথ।

কংগ্রেসী রাজত্বে চাকুরীতে উন্নতি

কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলি

সরকারী ঘোড়া বিক্র

কংগ্রেসী নীতি কাগজে লেখা থাকে—সত্যমেব জয়তে। বাস্তবে কংগ্রেসী আমলে সততার যেমন জয়জয়কার তাতে পুরানের রাম রাজত্বও ম্লান হয়ে যাবে। এক ভদ্রলোক পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী সরকার মশাইএর ওরিয়েণ্ট পেপার মিল এবং বিড়লার কেশোরাম কটন মিলের ফাঁকি ধরতে গিয়ে চাকুরী হারিয়েছেন। রেলে এক টিকিট চেকার এক বড় গোছের মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের ফাঁকি ধরিয়ে দেওয়ায় ডিগ্রেড হয়েছেন, পুলিশ বিভাগে ওপরওয়ালার সামনে সত্যি কথা বলার অপরাধে একজন হেড কন্‌স্টবল্ বরখাস্ত হয়েছেন। এই জাতের উদাহরণে কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাসের পাতা বোঝাই হয়ে আছে। এই সমস্ত কর্মচারীদের বোকা বলতে হবে, কারণ দীর্ঘ চার বছর কংগ্রেসী আমলে কাজ করার পরও যদি তাদের এতটুকু জ্ঞান না হয়ে থাকে কি করলে চাকুরীতে উন্নতি করা যায়, তাহ'লে তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে পারা যায় না।

কংগ্রেসী রামরাজত্বে উন্নতি করতে হলে-বেকসুর জালজালিয়াতি, চুরি জোচ্চুরি যত রকমের ভাল কাজ থাকতে পারে তা

খাদ্য বস্ত্র চাকুরী বাসস্থানের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপোষপন্থী নেতৃত্বের

★ চাল নেই, বাজরা খাও ★

অথচ খাদ্যশস্যের বদলে শিল্পের কাঁচামাল ফসল বাড়াও

সাধারণ লোক না খেয়ে মরুক, শিল্পপতিদের পকেট ভর্ত্তি হ'ক

★ *কংগ্রেসী খাদ্যনীতির রূপ* ★

কয়েকদিন আগে পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী, প্রফুল্ল সেন দেশবাসীকে বাজরা খাবার উপদেশ দিয়েছেন চালের অভাবের অজুহাতে। বাঙালী যে বাজরা খায় না এবং খেলেও এ দেশের জলবায়ুর গুণে নানা রোগে ভোগে এই কথাটি ভালভাবে জেনেও যেন মন্ত্রী মশাই আত্মতৃপ্তির ঘোরে বলেছেন, এদেশে তাঁরা ৪৯ লক্ষ ২১ হাজার [..]শত ৬৮জনকে আংশিক রেশন দেবার [ব্]যবস্থা করেছেন। অবশ্য কংগ্রেসী [স]রকারের আংশিক রেশন বলতে কি [ব]োঝায় তা জনসাধারণ ভালভাবেই বোঝে। কোন একটি শহরে এখন জনসংখ্যা হল ২২ হাজার সেখানে সরকার মোট ১২৫ মণ গম দিয়েছে, যা আবার ভাঙ্গাবার অসুবিধার জন্য পড়ে আছে। সরকারী হিসাব মতে, এই ২২ হাজার লোক আংশিক রেশনের সুবিধা পাচ্ছে। কত বড় চক্ষুলজ্জাহীন এবং অসত্যভাষী হলে এই ধরণের হিসাব দাখিল করা সম্ভব হয়, তা ভাবতেও অবাক লাগে তার ওপর আবার চাল ও গমের বদলে বাজরা খাওয়ার হুকুম।

শুধু পশ্চিম বাংলায় এই অবস্থা নয় ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যেই কংগ্রেসী খাদ্যনীতির কল্যানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনাহারে মৃত্যু লেগে আছে। ২৪ পরগণা হাওড়া, হুগলীর ভূখা মানুষ দুর্ভিক্ষবস্থা জানাতে গিয়ে মন্ত্রীদের পোষা পুলিশবাহিনীর হাতে গুলি, গ্যাস আর লাঠি খেয়ে ফিরে এসেছে, বিহার, মাদ্রাজ, রাজস্থান, আসাম সর্বত্রই দুর্ভিক্ষের কালছায়া নেমে এসেছে। অনাহারে মৃত্যুর হার প্রতি রাজ্যেই বেড়ে চলেছে। একমুঠা ভাতের অভাবে নওগাঁর তিনজন আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। সর্বত্রই আজ হা অন্ন! হা অন্ন রব। এই অবস্থায় দেশবাসীর প্রতি যার বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যবোধ আছে সেই স্বীকার করবে দেশে খাদ্যের পরিমান বাড়ান দরকার।

অথচ কংগ্রেসী সরকার মুখে সে কথা বলে কার্য্যতা তার বিপরীত নীতিই অনুসরণ করে চলেছে। অধিক খাদ্য ফলাও খাতে বছরে কোটী কোটী টাকা উড়ছে আর তার ফলে দেখা যাচ্ছে দেশে খাদ্যাভাব বেড়েই চলেছে। এর কারণ হল, কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতি। এখন উচিত খাদ্যশস্যের আবাদী জমির পরিমাণ দ্রুত হারে বাড়িয়ে যাওয়া, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করে চাষীর হাতে জমি দেওয়া এবং জনস্বার্থানুকুলে কৃষি সংস্কার করা কংগ্রেসী সরকার তা না করে খাদ্যশস্যের আবাদী জমি কমিয়ে তাতে শিল্পপতিদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে শিল্পের কাঁচা মাল উৎপাদন করতে হুকুমজারী করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের কথা না তোলাই ভাল সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় ডেপুটি খাদ্যমন্ত্রী, এম, ফিরুমলরাও যে হিসাব দাখিল করেছেন তাতে এই কথা প্রমাণ হয়।

	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১
খাদ্যশস্য—		১৯৪৩৭১ হাজার একর	১৯২৭২৬ হাজার একর
পাট—	৮৩৪ হাজার একর	১১৬৩ " "	১৪৪৯ " "
তুলা—	১১২৯৩ " "	১২১৭৩ " "	১৩৮৫৯ " "
তৈলবীজ	২৩৫৮৬ " "	২৪,৮৮৫ " "	২৫৯৮০ " "

খাদ্যশস্যের আবাদী জমিতে চাষ হচ্ছে পাট, তুলা, তৈলবীজ ওপরের সরকারী হিসাব এই কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরবে তবুও খাদ্যশস্যের বদলে পাট, তুলা, তৈল বীজের চাষ করা হবে—একে কোন নীতি বলে? এর নাম পুঁজিবাদী নীতি, যার একমাত্র লক্ষ্য হল শিল্পপতিদের মুনাফা লুঠবার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া, জনতার জীবনের চেয়ে ধনিক শ্রেণীর লাভ যার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। দেশে চাহিদার তুলনায় যাতে খাদ্যশস্য কম উৎপাদিত হয় তার চেষ্টা নিহিত রয়েছে কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির মধ্যে, কারণ তাতে বড় বড় জমিদার ও ব্যবসাদারদের কালবাজারীর সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ দেশকে চিরকাল খাদ্য বিষয়ে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কারণ এতে যেমন

একদিকে আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সাথে ব্যবসা করার সুবিধা থাকবে অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্য বিদেশ থেকে কেনার জন্য মন্ত্রীদের ঘরের লোককে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করে বেনামীতে কোটী কোটী টাকা মুনাফা লোটার সুবিধা থাকবে। সোভিয়েট ও মহাচীনের সাথে ব্যবসা করলে টাকার এই খেলটা চলে না, চাল বা গমের বদলে তারা কাঁচামাল নেয় তাই এই সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে কংগ্রেসী সরকার নারাজ এবং চুক্তি করলে তাকে কার্য্যকরী করা হয় না। উপরন্তু এই সব দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করলে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ গোসা করে তাই তাদের তল্পীদার নেহেরু সরকার তা করতে রাজী নয়। সোভিয়েট ও চীনের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেনার ব্যাপার লক্ষ্য করলেই এ কথার সত্যতা মিলবে। আর নিজের ঘরের লোককে হ্যাণ্ডলিং এজণ্ট নিযুক্ত করে টাকা লোটার কথা জানতে হলে বর্মা থেকে চাল কেনার ব্যাপারে বিড়লার একজন ও পণ্ডিতজীর জামাইএর ভাইকে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা এবং বর্মার চালের দাম অসম্ভবভাবে চড়া হওয়ার ইতিহাস খোঁজ নিতে হবে।

কংগ্রেসী কর্ত্তাদের এই জনস্বার্থ পরিপন্থী নীতিকে ব্যর্থ করে দিতে পারলে তবে জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। তার জন্য খাদ্যের দাবীতে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেশব্যাপী গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের সফলতাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করবে, জনতার খাদ্যসমস্যার সমাধান করবে—তাই সেই কাজেই দেশবাসীকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

[..]চুরী জোচ্চুরীই [..]র সার্টিফিকেট

[..]কমিশনারের নতুন পদ

[..] কথা ধামাচাপা

[..] টাকা রোজগার করতে হবে এবং [..]জন মন্ত্রী ধরে তোয়াজ করে চলতে [..]। যদি এই তোয়াজের ব্যাপারে [..]র মাল ভাগাভাগির কথা ওঠে তাতে [..] হয়ে যেতে হবে। এর নাম [..]সী সততা। বেশ কয়েকদিন আগে [..]ট দৈনিক পত্রিকা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব [..] কমিশনার এস, এন, চাটার্জীর [..] এক সংবাদ প্রকাশ করেন। তাতে [..]য় ঘোড়সওয়ার পুলিশবাহিনীর জন্য [..]স্ত ঘোড়া রাখা হয় তিনি সেগুলির কতকগুলি তাঁর এক ইংরাজ বন্ধুকে [..] করার ব্যবস্থা করে দিয়ে মোটা টাকা আত্মসাত করেন। এই খবর [..]নি হয়ে গেলে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী-[..] তাঁকে দিন কতক [..] ঢাকা দিতে [..] তিনিও বিলাত যাত্রা করেন। [..] শোনা গেল তিনি দেশে ফিরে[..]ন এবং পশ্চিম বাংলা রাজ্য সরকার [স্ব]রাষ্ট্র বিভাগের স্পেশাল অফিসার [..] করেছেন। কংগ্রেসী সরকার যে [..]কের কদর বোঝেন—এটাই তার [..] নিদর্শন নয়; প্যারিতে জাতিসংঘে [..]কারী এক ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি, যিনি অত্যধিক মদ্যপান করে রাত্রে অন্য একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির কাছে যাবার জন্য চেঁচামেচি করে সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের কাছে ভারতবর্ষের গৌরবধ্বজা উড়িয়েছিলেন তাঁকেও এইভাবে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে বৈদেশিক বিভাগে মোটা মাইনের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল। এ সবের পর কেউ প্রশ্ন করতে পারে না কংগ্রেসী সরকারের নীতির সততা নিয়ে।

ভ্রম সংশোধন

৩য় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে "পশ্চিম বাংলা ও সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট শিক্ষা সঙ্কটের বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ অভিযান" এর পরিবর্ত্তে "পশ্চিম বাংলা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট শিক্ষা সঙ্কটের বিরুদ্ধে সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধ অভিযান" হবে।

৬ পৃষ্ঠায়, "লোকায়ত্ত চীনের জাতীয় সংখ্যাসমূহের জীবনে নতুন প্রভাত :—টাস্

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের ইংরাজী মুখপত্র

Socialist Unity

৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

[..]াস ছিঁড়ে ফেলে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলুন

লোকায়ত্ত চীনে জাতীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে নতুন প্রভাত

এ, মাতিনোফ

চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেদেশের ৪ কোটি সংখ্যালঘু অধিবাসীদের জীবনে সুরু হয়েছে এক নতুন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। এই সব সংখ্যালঘু জাতি উপজাতি সাধারণত চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বসবাস করেন।

প্রাচীন চীনে মঙ্গোল, তিব্বতীয়, উইগুর, কানগান প্রভৃতি আরো কত জাতি ও উপজাতির কঠোর জীবনে না ছিল সুখ, না ছিল স্বস্তি। চীনা শ্রমিক শ্রেণীর মতো তাদেরও শোষণ করতেন, নির্য্যাতন করতেন স্থানীয় সামন্ত ভূস্বামীর দল আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা। বিদেশীরা চীনকে এক আধা-উপনিবেশে পরিণত করে ছেড়েছিলেন। চীনা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে দুঃখ দুর্ভোগের অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ঐ সব সংখ্যালঘুদের জীবনে ছিল আর একটি অতিরিক্ত দুর্ভাগ্য। তা হচ্ছে জাতিগত নিপীড়ন। চীনা জমিদার পুঁজিপতি ও সরকারী কর্মচারীরা প্রতি পদে অ-চৈনিক উপজাতিদের জাতীয় মনোভাবের উপর আঘাত করতেন, তাদের ভালো ভালো জোতজমি কেড়ে নিতেন, তাদের শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য করতেন, তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ব্যবহার করতে দিতেন না এবং তাদের জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। এই অনুদার নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে শতকরা ১০০ জনই ছিলেন নিরক্ষর। ব্যাধি আর মহামারী ছিল তাদের নিত্য সহচর।

রুশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চীনের জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর পুরোধী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় যখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াংকাইশেক চক্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, কেবল তখনই চীনা সংখ্যালঘু জাতি-উপজাতিদের সম্মুখে জাতীয় মুক্তি ও নবজীবনের সম্ভাবনা উম্মুক্ত হল। চীনের জাতীয় মুক্তি ফৌজে তখন চীনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন কোরিয়ান, মঙ্গোল, উইগুর, তিব্বতীয় ইত্যাদি জাতি-উপজাতিরা। চীনের জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে তারা চিরতরে অপসারিত করেছেন সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার জগদ্দল পাষাণ।

চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম করণীয় কর্ত্তব্যগুলির একটি ছিল সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে নতুন নীতির ঘোষণা। এই নয়া নীতির ভিত্তি হচ্ছে জাতি সমস্যা সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষা এবং বহু-জাতিক সোবিয়েৎ ভূয়সী অভিজ্ঞতা।

চীনের জনগণের মহান সনদে চীনের সমস্ত সম্প্রদায় ও উপজাতির সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কারো জাতীয় অনুভূতির উপর আঘাত কিংবা কারো জাতীয় স্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। জাতীয় সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ও লিপির উন্নতি সাধনের এবং নিজস্ব আচার প্রথা ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখার কিংবা প্রয়োজন বোধে সংস্কার করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতি-উপজাতিদের ইসলাম বৌদ্ধ মতবাদ ইত্যাদি ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ কিংবা তাদের ধর্ম্মগুরু বা অনুপন্থীদের উপর হামলা আইনের বলে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চীনের সংখ্যালঘুরা ইতিহাসে এই প্রথম দেশ শাসনের সুযোগ পেলেন। চীনা প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকারী পরিষদ হচ্ছে দেশের সর্ব্বোচ্চ শাসন-যন্ত্র। এই পরিসদে চীনা সদস্য ছাড়াও বৃহৎ অচৈনিক জাতি-উপজাতির প্রতিনিধি উলাং-ফু এবং উইগুর প্রতিনিধি সাফুদ্দিন। জাতি-উপজাতিগুলির বিবিধ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি সংখ্যালঘু জাতি-উপজাতি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে প্রধান প্রধান সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধিরা স্থান পেয়েছেন।

প্রাদেশিক ও জেলা শাসন-তন্ত্রগুলিতেও অচৈনিক জনগণের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। যেমন, উত্তর-পশ্চিমে সামরিক রাজনৈতিক কমিটির ৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন হচ্ছেন সংখ্যালঘু জাতি-উপজাতির প্রতিনিধি—৪ জন সুঙ্গান, ২ জন উইগুর, ২ জন মঙ্গোল ও ২ জন তিব্বতীয়। দক্ষিণ-পশ্চিম সামরিক-রাজনৈতিক কমিটিতে ৫ জন তির্ব্বতীয় প্রতিনিধি রয়েছেন—৩ জন লি উপজাতি থেকে এবং ২ জন মিয়াও উপজাতিদের মধ্যে থেকে। অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতি থেকেও দু চার জন সদস্য লওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয়-দক্ষিণ সামরিক রাজনৈতিক কমিটিতে ২ জন সদস্য জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি। সিংকিয়াং প্রদেশে নানা জাতি-উপজাতির বাস। এখানে লোকায়ত্ত সরকারী পরিষদে সদস্যদের বেশির ভাগই হচ্ছেন সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি: মোট ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জনই সংখ্যালঘুদের মুখপাত্র।

অধিকন্তু যে সব অঞ্চলে বেশির ভাগ লোক চীনা নয় সেখানে জাতীয় স্বায়ত্ত শাসন চালু করার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই জাতীয় সর্ববৃহৎ অঞ্চল হচ্ছে আন্তঃমঙ্গোলিয়া। মঙ্গোল-অধ্যুষিত এই অঞ্চলের আয়তন হবে ফ্রান্স ও ইতালীর মোট আয়তনের সমান। গত বছর সিংকাঙ্গ প্রদেশে তিব্বতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও ইতসু উপজাতীয়দের এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, সিংকিয়াং প্রদেশে উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম চীনে এক তুদান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত হয়েছে। বর্তমান বৎসরে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও তিব্বত গভর্নমেণ্টের মধ্যে ২৭শে মে তারিখে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাতে তিব্বত লোকায়ত্ত মহাচীনের অন্তর্ভুক্ত হল এবং তিব্বতের জনগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করলেন। অচৈনিক অধিবাসীরা সংখ্যায় অধিক এমন আর সব অঞ্চলেও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের তোড় জোড় চলছে।

অনগ্রসর অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য চীনের কেন্দ্রীয় সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। হাইনান দ্বীপের পার্ব্বত্য অঞ্চলে মায়ও ও লি এই দুই উপজাতির বাস। পূর্ব্বে এখানে কেবল স্কুল বা ডাক্তারখানা ছিল না। আজ লোকায়ত্ত চীনের গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে সেখানে চালু হয়েছে ১১৭টি প্রাথমিক স্কুল এবং বিভিন্নজাতির ১৭ হাজার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পাঁচশতাধিক স্বাস্থ্য বিদ্যালয়। দুটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রও ঐ অঞ্চলে খোলা হয়েছে।

আন্তঃমঙ্গোলিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আগে লেখাপড়া জানা লোক ছিল না বললেই হয়। আজ সেখানে ২৮৭৪টি প্রাথমিক স্কুলে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শ ছেলে মেয়ে (স্কুলে যাবার বয়েস হয়েছে এমন শিশুদের শতকরা ৬১ জন) পড়াশুনা করছেন, উক্ত অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাও সর্বত্র চালু হচ্ছে। অতীতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক প্লেগের কবলে পড়ে মারা যেতেন কিন্তু সোবিয়েৎ দেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও সহযোগিতায় প্লেগ মহামারীর প্রকোপ এখন আর নেই বললেই চলে। ১৯৪৭ সালে প্লেগে মৃত্যু হয়েছিল ১৫,৭১০ জন লোকের। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই প্লেগে মৃত্যুর মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪৫ জন। গত বৎসর প্লেগ হয়ে মারা গিয়েছেন মাত্র ১৯ জন লোক।

ঐ সব অঞ্চলের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের কাজে চীনের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়েছেন। কোন কোন স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চলে (যেমন আন্তমঙ্গোলিয়ায়) অধিকাংশ অধিবাসীর অভিপ্রায় অনুসারে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করা হয়েছে। জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে তা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বা যাদের যৎসামান্য জমি আছে তাদেরকে।

জাতীয় নীতিকে বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টার ফলে আজ কোটি কোটি সংখ্যালঘু অধিবাসী কেন্দ্রীয় সরকার ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির পেছনে এসে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চীনা ভাইদের সম্পর্কে অচৈনিক লোকদের মনে আজ আস্থা ও বিশ্বাস স্থায়ী আসন পেতে বসেছে, মুক্ত চীন দ্রুত এক বহু জাতিক পরিবারে পরিণত হতে চলেছে। সেই মহারাষ্ট্রে সব জাতি উপজাতির সমান অধিকার সকলেই সেখানে একজাতি পরস্পরের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করে চলে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের গণস্বার্থ বিরোধী পুরান আমল ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত তারা সকলে মিলে বাহু বলে বানচাল করে দেবে।

সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তুতি

প্রগতিশীল ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ

ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশের ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কমরেড উমাশঙ্কর প্রসাদ, রামবদন রায়, সুকোমল দাস গুপ্ত, পরমানন্দ জানা, গায়ত্রী দাস গুপ্তা ও মহম্মদ আবুহোসেন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

আমরা ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজের বর্ত্তমান নিদারুন অবস্থা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ছাড়াও আজ ছাত্রদের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির খড়্গ ঝুলিতেছে। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর ছাত্রদের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যাইতেছে পূর্ব্বের সমস্ত গৌরবময় ঐতিহ্য দিনের পর দিন ছাত্রসমাজ হারাইতে বসিয়াছে। উপরন্তু, এই দুর্দ্দিনে কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠানই দলীয় গণ্ডী ও সঙ্কীর্ণ নীতি ত্যাগ করিয়া ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ও সঠিকপথে পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় নাই। যে আশা আকাঙ্খা লইয়া একসময়ে ছাত্র সাধারণ জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফৎ তাহার পরিপুরণ তো হয়ই নাই, পূর্ব্বের কেন্দ্রীয় সংযুক্ত সংগঠন বর্ত্তমানে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে তদুপরি, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারপুষ্ট ও তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি বিভেদ ও প্রতিক্রিয়ার এক ঘোরালো অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। ছাত্রদের ভিতর এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ লইয়া শক্তি পূর্ণমাত্রায় গ্রহন করিতেছে।

কংগ্রেসী সরকারের স্বৈরাতান্ত্রিক অনাচার

★ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের পাকা ব্যবস্থা ★

নির্ব্বাচনের আগে বিরুদ্ধবাদীদের বলার সুযোগ হতে বঞ্চিত করার প্রয়াস

স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবীতে তুমুল আন্দোলন করে স্বৈরাচারের উপযুক্ত জবাব দিন

সাধারণ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকার ততই বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য সর্বরকম বাঁধন পাকা করছে। হাইকোর্টের বিচারে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ রাজবন্দীরা মুক্তি পেতে থাকলে কংগ্রেস সরকার তাদের নিজেদের দ্বারা গৃহীত গঠনতন্ত্রকে পরিবর্ত্তন করে। এমনিতেই যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে তাতে জনসাধারণের কোন দাবীই কার্য্যকরী হয় নি তার ওপর ব্যক্তি স্বাধীনতার যে দাবীগুলি কাগজে পত্রে স্বীকৃত হয়েছিল সেগুলিও কংগ্রেস সরকার নাকচ করে দেয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য নির্বাচনের আগে যেন বিনা বিচারে বন্দী রাজবন্দীরা মুক্ত না হন এবং নির্বাচনের সময় যেন কংগ্রেস বিরোধীদের ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করা যায়।

কংগ্রেসী সরকারের এই স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদ দেশের প্রত্যেকটি প্রগতিবাদী লোক করেছেন। স্বাধীনতা প্রিয় সংবাদপত্রগুলি এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল। তাই ফ্যাসিষ্ট কংগ্রেসী সরকারের কোপ পড়েছে সংবাদপত্রের উপর। অত্যাচারী শাসকের দল ভালভাবেই জানে, জনমত সংগঠন করার কাজে সংবাদপত্রগুলির ক্ষমতা অসীম। তাই তারা একদিকে যেমন চেষ্টা করে টাকা পয়সা দিয়ে এদের কিনে নিতে অন্যদিকে তেমনি কালা কানুনের জোরে যে সমস্ত পত্রিকা টাকার লোভে বিবেক বিসর্জন দিতে রাজী নয় তাদের কণ্ঠ-রোধ করে। ভারতবর্ষেও তাই চলেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ সংবাদপত্র কংগ্রেসী সরকারের জয়ঢাক। বাকি যে কটা সংবাদপত্র কংগ্রেস বিরোধীতা করছে তাদের জব্দ করে নির্বাচন জেতার মতলবেই নতুন প্রেস (ইনসাইটমেণ্ট টু ক্রাইম) বিল আনা হয়েছে।

পুরান যে সমস্ত প্রেস আইন ছিল তার অধিকাংশগুলিই হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারে বেআইনী বলে স্থির হয়েছে। তাই নতুন করে এই বিল, রাজাগোপাল ও নেহেরু যতই বলুন না কেন, দেশের মধ্যে সর্বত্র যাতে একটি সুস্থ ও শালীন প্রেস আইন থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হয়েছে কিন্তু আদতে এর উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ কণ্ঠকে বন্ধ করা। বিলের ধারাগুলি পড়লেই এ কথার প্রমাণ মিলবে। ইংরাজ আমলে প্রেস আইনগুলিতে যে অনিষ্টকর ধারাগুলি ছিল তার সব কটাই বর্ত্তমান বিলেও আছে। এমন কি ১৯২১ সালে বিদেশী শাসনের কালে ১৯০৮ সালের প্রেস আইন তুলে দেবার যে সিদ্ধান্ত তৎকালের বিদেশী শাসকের দল করে, কংগ্রেসী সরকার সে আইনগুলিকেও তুলে না দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে বর্ত্তমান আইনে লিপিবদ্ধ করেছে। বর্ত্তমানে বিলটী এত ব্যাপক ভাবে গণতন্ত্র বিরোধী যে কংগ্রেসের জয়-ঢাক সংবাদপত্রের পুঁজিপতি মালিকের দলও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছে।

বিলে আপত্তিকর বিষয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে যে কোন বিষয়ই সরকার ইচ্ছা করলে আপত্তিকর বলতে পারে এবং সে কারণে শাস্তিও হতে পারে। প্রথমতঃ reducing the authority of the government in any area or compelling it to exercise or refrain from exercising its lawful authority or power in any matter —এই রকম কোন কথা বা প্রতীক ব্যবহার করলে তা হবে বেআইনী। অর্থাৎ সরকার যদি কোন বেআইনী আইন ভোটের জোরে পাস করিয়ে নেয় তাহলে তার বিরুদ্ধেও কিছু বলা যাবে না, কারণ তাহলেই তা সরকারের আইন মতে ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে খাদ্য বা আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের যোগান ও বণ্টন সংক্রান্ত শাসন ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটালে তা বেআইনী কাজ বলে ধরা হবে। এখন কংগ্রেস সরকার চাষীদের কাছ থেকে যে ধান লুট করার নীতি চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কিংবা বণ্টনের নামে যে সরকারী দুর্নীতি চলেছে তার ওপর কিছু লিখলেই সরকার বলবে এ লেখা দ্বারা শাসন ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটেছে, সুতরাং শাস্তি হবে। শুধু তাই নয়, যে অসংখ্য ভুখা মানুষের দল খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন করছে তার সমর্থনে কিছু লিখলে কিংবা ছবি ছাপালে তাও বেআইনী হবে। তৃতীয়তঃ সৈন্য বা পুলিশী বাহিনীতে নিযুক্ত কোন লোকের সরকারের প্রতি আনুগত্য কমে যেতে পারে বা ঐ সব বিভাগের নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গ হতে পারে বা ঐ সব বিভাগে লোক নিয়োগে ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু লিখলে বা ছাপালে তাও বেআইনী। এর ফলে পুলিশী ও সৈন্য বিভাগে দুর্নীতির কথা বলা যাবে না, কারণ তাতে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উচ্চপদস্থদের প্রতি আনুগত্যের ভাব কমে যেতে পারে ; সরকারের যুদ্ধ রাজনীতি সমালোচনা করা সম্ভব হবে না এমন কি পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের কথা বলা চলবে না। চতুর্থতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ বাড়তে পারে এমন কিছু লেখা যাবে না। এর ফলে জমিদারী প্রথা বিলোপ দাবী করা যাবে না এমন কি শ্রেণী সংগ্রামের কথা প্রচার দার্শনিকভাবে করলেও তা বেআইনী সংজ্ঞায় পড়বে। এই ধরণের অসংখ্য বাঁধনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে জবাই করা হয়েছে এই বিলে।

কংগ্রেসী সরকারের অধীনে প্রথম বলি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। বর্ত্তমানে যে শাসন চলেছে চণ্ডনীতিতে তা এণ্ডারসনীয় শাসনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ অবস্থার প্রতিকার করতে না পারলে, না যাবে সত্য প্রকাশ করা, না যাবে সরকারের ন্যায় সঙ্গত সমালোচনা করা, না যাবে জনতার নিজস্ব দাবীদাওয়ার জন্য জনমত সংঘবদ্ধ করা। আর এই স্বৈরাচারী আইন থাকলে সাধারণ নির্বাচন হবে প্রহসন ; জনতার কোন কথাই কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। কংগ্রেস সরকার গদীতে ; কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে প্রচারকে সরকার বিরোধী প্রচার বলে আটক রাখা থেকে আরম্ভ করে জরিমানা; খবরের কাগজ তুলে দেওয়া সবই চলবে। সুতরাং জনস্বার্থের খাতিরে এই কলঙ্কময় বিলের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলে কংগ্রেসী সরকারের ফ্যাসিষ্ট নীতিকে ব্যর্থ করুন।

সারা ভারত ছাত্র কনভেনশনের প্রস্তুতি

এই অচলাবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ভারতবর্ষের ছাত্রদের একটি নিজস্ব কেন্দ্রীয় শক্তিশালী সারা ভারত সংগঠন গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করিতেছি। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসরাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরাচারিতা ও শিক্ষা ক্ষেত্রের গলদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিরাট ছাত্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই হইবে এই ছাত্র সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। ইহা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে সম্মেলন হইতে যাইতেছে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমরেড সুকোমল দাসগুপ্তকে আহ্বায়ক করিয়া "সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনের" প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমরা ছাত্র সমাজকে এই সম্মেলনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য নিম্ন লিখিত দাবীর ভিত্তিতে প্রতিটী বিদ্যায়তনে প্রস্তুতি কমিটী (Institutional Preparatory Committee) গঠন করিবার আহ্বান জানাচ্ছি।

১। শিক্ষাখাতে খরচ বাড়াইতে হইবে।

২। ছাত্রদের মাহিনা কমাইতে হইবে।

৩। শিক্ষকদের বেতন বাড়াইতে হইবে।

৪। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন চাই।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ ও আমূল পরিবর্ত্তন চাই।

৬। কারিগরি ও মেডিকেল শিক্ষার বহুল প্রচলন চাই।

৭। প্রত্যেক বিদ্যায়তনে লাইব্রেরী কমনরুমের সুবন্দোবস্ত চাই।

৮। শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির অবসান চাই।

৯। পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন।

১০। হষ্টেল সমূহের সুবন্দোবস্ত ও কম খরচ প্রবর্ত্তন।

১১। স্কুল কলেজে ছাত্রদের আন্দোলন ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার স্বীকৃতি।

১২। বাস্তহারা ছাত্রদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি।

বিশদ বিবরণের জন্য সুকোমল দাসগুপ্ত অহ্বায়ক, সারা ভারত ছাত্রসম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

মার্কিনের পায়ে ভারতের খণিজ সম্পদ বিসর্জন

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কয়লার খনির অধিকাংশই ইংরাজ কোম্পানীগুলির অধীন। আর এই দামী উন্নত ধরণের সম্পদই রপ্তানী করা হচ্ছে। ফলে একদিকে ভারতবর্ষে অবস্থিত ইংরাজ কোম্পানীগুলির লাভ হচ্ছে অন্যদিকে ভারতবর্ষ সম্পদের দিক থেকে হীনতর হচ্ছে।

ক্রোমাইটের বেলায় আরও জঘন্য নীতি অবলম্বিত হয়েছে। এই খনিজ সম্পদটি Stainless Steel, Electrical resistance alloy প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় ইস্পাত তৈরীর কাজে অপরিহার্য্য। উপরন্তু বলতে গেলে ভারতবর্ষই এই জিনিষটির একচেটে অধিকারী। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের অংশে শতকরা ৩৭ ভাগের মত পড়েছে। আমাদের দেশের ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য এই দ্রব্যটির রপ্তানী একেবারেই বন্ধ করা উচিত। অথচ নামমাত্র দামে (তিন লাখ টাকার মত) বছরে আমরা পাঁচ হাজার টন ক্রোমাইট মার্কিন মুল্লুকে রপ্তানী করছি।

তৃতীয় জিনিষ হল ম্যাঙ্গানিজ, ভারতবর্ষের প্রায় একচেটে সম্পদ। সোভিয়েটে কিছু পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ আছে কিন্তু তা রপ্তানী করা হয় না। উপরন্তু সোভিয়েটে আকরিক পাথরে যেখানে শতকরা ১৮ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ আছে সেখানে ভারতীয় পাথরে আছে শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ। মরণাস্ত্র তৈরীর জন্য আমেরিকা এই ম্যাঙ্গানিজ আমাদের কাছ থেকে জলের দরে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৯—৫০ সালে ৫, ৮৪, ৮১, ৯৪৭ টাকার ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী করা হয়। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস হওয়ার পর রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভ্রের ব্যাপারও তাই। প্রতি বছর ভারতবর্ষের অভ্রের রপ্তানী বেড়ে চলেছে। নীচের তালিকা তার প্রমাণ দেবে।

কোথায় যায়	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
বৃটেন	১৪০৯৭৯১৭	১০৫৯২০২৮	১৪৫২৫২৮৯
ফ্রান্স	১১৭৬০৪৭	১৪৪৫৭৩৫	১৩৯৪৪১৬
জাপান	১২৭৩৪২৭	৭৪২৯০৮	৮২৯৮৯৯
আমেরিকা	৩৮৮৫১৩৯০	৫০০৫১৪০০	৬৭৩২৫৮১০
অন্যান্য দেশ	৩৯৭৫০৮৮	৫৬২৬৩৩৯	১১৯৮২১০৫
	৫,৯৩,৭৩,৮৬৯	৬,৮৪,৫৮,৪১০	৯,৬০,৫৭,৫১৯

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কংগ্রেসী সরকার জেনে শুনে ভারতবর্ষের এই বিরাট সম্পদ কেন রপ্তানী করতে দিচ্ছে। জবাব সোজা। কংগ্রেসী সরকার ধনিক শ্রেণীর সরকার, তার একমাত্র চেষ্টা পুঁজিপতিদের লাভ বাড়ান। দেশের এই সব অমূল্য সম্পদ রপ্তানী করতে দিলে এদেশের দেশী বিদেশী কোটীপতিদের লাভ বাড়ে। সুতরাং তাই অবাধে এই সব জিনিষ রপ্তানী করা হচ্ছে। লাভের পরিমাণের হিসাব দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। অভ্রের কথাই ধরা যাক। প্রতি মণ অভ্র উৎপাদনের খরচ এখন সর্বোচ্চপক্ষে ৫০৲ রপ্তানী দাম ৩৫০৲। সুতরাং প্রতিমণে লাভ ৩০০৲ টাকা। এই বিরাট সুযোগ ধনকুবেরদের দেওয়া হচ্ছে, দেশ তাতে নিঃস্ব হলেও কংগ্রেসী নেতাদের ক্ষতি নেই। দেশের সরকারের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার ইচ্ছা নেই ; পিছিয়ে পড়া দেশের পুঁজিবাদী সরকার দেশের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ে বিকিয়ে দিয়ে ধনিক শ্রেণীর পকেট ভর্ত্তির ব্যবস্থা করে। কুয়োমিনটাঙ চীনের চিয়াং তাই করেছে, আমাদের দেশে কংগ্রেসী সরকার তাই করছে। আজ চীনে লোকায়ত্ত গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই সেখানে এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ হয়েছে ; আজ আর মহাচীন খনিজ সম্পদে পূর্ণ দরিদ্র চৈনিক জনসাধারণের দেশ নয়। সেখানকার মানুষ নিজের ভাগ্য গড়ার সুযোগ পেয়েছে, খনিজ সম্পদ আজ সেখানে জাতির সম্পদ, দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে আজ মহাচীন এগিয়ে চলেছে। আমাদের দেশেও তা হবে, যবে জনতা প্রকৃত ক্ষমতা পাবে। তা না হলে এই ধরণের শোষণের পালা চলবে।

শ্রমিক নেতা পূনদেও সিংএর কারাদণ্ড

(সংবাদদাতা)

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর হাওড়ার বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট শ্রমিক সংগঠক পূণদেও সিংকে "অশোক গ্লাস ওয়ার্কসের" শ্রমিকদের অসন্তোষ লইয়া আন্দোলনের প্রচেষ্টা ও অনধিকার প্রবেশের অজুহাতে হাওড়া কোর্টে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে ষাট টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিন সপ্তাহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে গত জুন মাসে "অশোক গ্লাস ওয়ার্কস"এ শ্রমিকদের মাগগী ভাতা বৃদ্ধি ও সময় মত হপ্তার দাবীতে ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি চলিতেছিল। সেই সময় মালিক কমরেড পূণ দেও সিংকে ডাকিয়া বহুক্ষণ আলোচনা করেন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় মালিক তাহাকে কারখানায় আটক করে এবং পুলিসের হাতে অর্পন করে। এই ঘটনায় সরকারের মালিক-তোষণনীতি আর একবার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নির্বাচন ও জনগণের কর্ত্তব্য

- আগামী সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে।
- আপনার ভোটদেবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কিনা দেখুন।
- এই বেলা প্রতিজ্ঞা নিতে হবে—
- কংগ্রেসকে একটি ভোটও দেব না।
- কংগ্রেস পন্থী বড় লোকদের দল গুলোর কথায় ভুলবো না।
- সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভেদ বানচাল করবো।
- সোস্যালিষ্ট পার্টি ও তথাকথিত জন দরদীদের মুখোস খুলবো।
- বামপন্থীদের সংগ্রামী ঐক্য গড়বো।
- রুটি, রুজি, বাসস্থান, শিক্ষার দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বাছাই করবো।
- মেহন্নতী জনতার দল ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হবো।

"নতুন পৃথিবীর জন্যে"

রচনা—জুলফিকার

অসাধারণ শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে কবিতার বই বের হ'ল, বইটিতে বর্ত্তমান শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখক সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন।

দাম—দু'টাকা আট আনা

পাক-ভারতের সমস্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

★ আর্থিক সংকটের হাত থেকে মেহন্নতী জনতার মুখপত্র 'গণদাবী'কে বাঁচাতে আপনার যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করেছেন কি ?

★ আপনার রুটি, রুজি ও আদর্শের জীবন সংগ্রামের সাথী এবং পথ প্রদর্শক, 'গণদাবীর' আত্মপ্রতিষ্ঠায় আপনার ন্যায্য অংশ নিয়েছেন কি ?

★ জীবন-সংগ্রামের পথে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার 'গণদাবী'র সংগ্রামী প্রচেষ্টায় আপনার সাহায্য অনতিবিলম্বে পাঠান।

'গণদাবী তহবিলে' আপনার সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা 'গণদাবী তহবিল' ৪৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ ১৩,

"ম্যানেজার গণদাবী"

GRAND OPPORTUNITY !

EASTLAND AGENCY

THE HOUSE OF :—

Manufacturers, Representatives, Commission Agents, Electrical Decoratoss, Sound Engineers & General Order Suppliers.

Contact Immediatly for your Puja Electrical Decoration & Microphone Installations

1A, EXHIBITION ROW
PARK CIRCUS, CALCUTTA-17

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিকসন লেন, হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।